ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও গুরুত্ব

ভূমিকা

কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনাই এর মূল লক্ষ্য। সামাজিক গবেষণায় কর্মসহায়ক গবেষণা (Action Research) একটি নবতর সংযোজন। চল্লিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষায় কর্মসহায়ক গবেষণা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সাধারণভাবে Kurt Lewin-কে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা প্রবর্তনের জনক বলা হয়। ১৯৫৩ সালে স্টিফেন কোরীর লেখা বই "Action Research to Improve School Practice" প্রকাশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় প্রথম কর্মসহায়ক গবেষণা প্রয়োগের ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার সূচনা হয়। সত্তরের দশকে কর্মসহায়ক গবেষণা এক ভিন্ন মাত্রায় নবরূপে গুরুত্ব লাভ করে। Stenhouse যুক্তরাজ্যে "teacher as researcher" ("গবেষক হিসেবে শিক্ষক") এই ধারণার বিকাশ সাধন করেন। গত তিন দশক ধরে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণা আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা ধারার কার্যকর প্রভাব লক্ষ্য করে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ শিক্ষাক্ষেত্রে এ ধারা প্রয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টিকিউআই-সেপ প্রকল্পও শিক্ষক প্রশিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষ বা বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণা করতে প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষক উভয় পক্ষকেই উৎসাহিত করছে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।
- কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক : কর্মসহায়ক গবেষণার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

- প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, আমরা কর্মসহায়ক গবেষণা ও তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব। তার পূর্বে আপনারা গবেষণা বলতে কী বোঝেন তা নিজেদের খাতায় লিখুন এবং পরবর্তীতে মূল শিখনীয় বিষয় পড়ে আপনাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করুন।

- প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, মূল শিখনীয় বিষয় পাঠ করে ইতোমধ্যে কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা স্বচ্ছ করেছি। এবার কর্মসহায়ক গবেষণা সম্পর্কে সহপাঠীদের সাথে দলগত আলোচনা করুন ও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।

কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে। স্টুয়ার্ট এর মতে, "কার্যোপযোগী গবেষণা এমন একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ কোন সামাজিক পরিবেশে (যেমন- শ্রেণিকক্ষ, গোষ্ঠি, এলাকা) তাদের নিজ অবস্থা/পরিস্থিতি (অথবা সমস্যা) অনুসন্ধান করতঃ তা উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।" বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করা এর মূল লক্ষ্য। কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভর ও প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক (situational)। সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উক্ত প্রেক্ষাপটেই সমস্যার সমাধান করার সাথে এটি জড়িত। এই গবেষণা পর্যবেক্ষণযোগ্য অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষণলব্ধ সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই গবেষণা অংশগ্রহণকেন্দ্রিক (participatory) এবং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া।

কাজ-১-১.১

- এবার, নিজের মত করে কর্মসহায়ক গবেষণার একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা লিখুন এবং আপনার সহপাঠীদের লিখিত সংজ্ঞার সাথে তুলনামূলক বিচার করুন।

কাজ-১-১.২

- কর্মসহায়ক গবেষণার বৈশিষ্ট্যগুলো পোস্টার পেপারে উপস্থাপন করুন (টিউটোরিয়াল সেশনের ক্ষেত্রে)।

কাজ-১-১.৩

- প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, মূল শিখনীয় বিষয়বস্তুর সহায়তা নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ছকের ডান পাশের কলামে লিখুন।
-

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	উত্তর
১	কখন কর্মসহায়ক গবেষণা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে?	
২	কর্মসহায়ক গবেষণার জনক কে?	
৩	"Action Research to Improve School Practice" কার লেখা?	
৪	"Teacher as researcher" "গবেষক হিসেবে শিক্ষক" এই ধারণার বিকাশ সাধন করেন কে?	
৫	কোন দশককে সহযোগিতাভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণার যুগ বলা হয়?	

পর্ব -খ : শ্রেণি শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব

সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বা পেশাগত চর্চার বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন এনে এর উন্নয়ন ঘটানো কর্মসহায়ক গবেষণার কাজ। তাই শ্রেণি শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রশাসনসহ যে কোন পেশাদার বা প্রাকটিশনার - এর উন্নত অনুশীলনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশাসক এর মনে আত্মসমালোচনার মনোভাব গড়ে ওঠে বিধায় তারা নিজ পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন। সে ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ অতিক্রম করার চেষ্টা করেন। এই ধরনের গবেষণা শিক্ষক তার কর্মস্থলে সম্পন্ন করতে পারেন। ফলে শিক্ষক তার নিজস্ব সময় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে পারেন। স্থানীয়ভাবে স্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে অন্যান্য গবেষণার ন্যায় এই গবেষণার জন্য খুব বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় না। এই গবেষণা গণতান্ত্রিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে স্থানীয় (যেমন: শ্রেণি শিক্ষক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ইত্যাদি) সকলের অংশগ্রহণে ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সহমর্মিতার ভিত রচিত হয় এবং আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়।

কাজ-১-১.৪

- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব আছে কী? কর্মরত শিক্ষক হিসেবে আপনার মতামতের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

গবেষণা কী?

গবেষণা হল সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। গবেষণা এক প্রকারের জ্ঞান অন্বেষা যা বিশেষ যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজাই হচ্ছে এর লক্ষ্য।

গ্রীনের মতে, "জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য মানসম্মত পদ্ধতির প্রয়োগকেই গবেষণা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়"।

Francis Rummel এর মতে, "গবেষণা হল জ্ঞানের আবিষ্কার, বিকাশ ও যাচাইয়ের একটি প্রচেষ্টা। এটি এমন একটি বুদ্ধিদীপ্ত প্রক্রিয়া যা শত শত বছরে বিকাশ লাভ করেছে। এর উদ্দেশ্য, কাঠামো চিরকালই পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু সর্বদাই করেছে সত্যের অনুসন্ধান"।

মেরী, ই. ম্যাকডোনালের মতে, "Research may be defined as a systematic investigation intended to add available knowledge in a form that is communicable and verifiable".

কর্মসহায়ক গবেষণার পটভূমি

সামাজিক গবেষণায় কর্মসহায়ক গবেষণা একটি নবতর সংযোজন। চল্লিশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষায় কর্মসহায়ক গবেষণা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। অনেকের ধারণা এই গবেষণা ধারার সূত্রপাত হয় বিশ শতকের গোড়ার দিকে। শিক্ষা সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ, জন ডিউই এর পরীক্ষণকেন্দ্রিক ও প্রগতিশীল শিক্ষা চিন্ড্রর বিকাশ, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও মানব সম্পর্ক উন্নয়ন প্রশিক্ষণে দলগত প্রচেষ্টা আন্দোলন, যুদ্ধোত্তর শিক্ষাক্রম বিকাশে পুনর্গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ- এসব সামাজিক ও শিক্ষাগত আন্দোলনের মধ্য দিয়েই কর্মসহায়ক গবেষণার ভিত রচিত হয় এবং তখন থেকেই এর উন্মেষ ঘটতে থাকে। সাধারণভাবে Kurt Lewin-কে কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা প্রবর্তনের জনক বলা হয়।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আমেরিকার "Commission on Community Interrelations" বেশ কিছু কর্মসহায়ক গবেষণা প্রজেক্ট পরিচালনা করে। তবে এই গবেষণা ধারাকে শিক্ষকদের জন্য প্রথম ব্যবহার করেন স্টিফেন কোরী। ১৯৫৩ সালে কোরীর লেখা "Action Research to Improve School Practice" প্রকাশনার মধ্য দিয়ে শিক্ষায় প্রথম কর্মসহায়ক গবেষণা প্রয়োগের ধারাবাহিক ও পদ্ধতিগত প্রচেষ্টার সূচনা হয়।

কর্মসহায়ক গবেষণার প্রতি শিক্ষাবিদদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় পঞ্চাশের দশকে। শিক্ষাক্রমের নকশা প্রণয়ন ও বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমালোচনায় এই গবেষণা সাধারণ কৌশল হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়কে সহযোগিতাভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণার যুগ বলা হয়। এই দশকের শেষের দিকে কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষাবিদদের সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাবিদদের আগ্রহ লোপ পায়। সত্তরের দশকে কর্মসহায়ক গবেষণা ধারা পুনরায় গুরূত্ব লাভ করে। Stenhouse যুক্তরাজ্যে "teacher as researcher" "গবেষক হিসেবে শিক্ষক" এই ধারণার বিকাশ সাধন করেন। গত তিন দশক ধরে শ্রেণিকক্ষ কর্মসহায়ক গবেষণা আন্দোলন যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপে বিস্তৃতি লাভ করেছে।

কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে গবেষণা পরিচালিত হয় তাকে কর্মসহায়ক গবেষণা বলে।

স্টুয়ার্ট এর মতে, "কর্মসহায়ক গবেষণা এমন একটি ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ কোন সামাজিক পরিবেশে (যেমন: শ্রেণিকক্ষ, গোষ্ঠি, এলাকা) তাদের নিজ অবস্থা/পরিস্থিতি (অথবা সমস্যা) অনুসন্ধানকরতঃ তা উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করা এই গবেষণার অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া"।

কর্মসহায়ক গবেষণা একটি সমষ্টিগত, আত্ম-প্রতিফলনমূলক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যা সমাজের সদস্যদের দ্বারা তাদের নিজেদের কার্য প্রক্রিয়া বা সামাজিক আচরণ বা চর্চার উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত হয় (Kemmis and McTaggart 1988)। লেখকদ্বয় এ গবেষণাকে সামষ্টিকভাবে পরিচালিত স্ব-মূল্যায়নভিত্তিক অনুসন্ধান হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন, এর দ্বারা অংশগ্রহণকারীরা সামাজিক পরিবেশে তাদের নিজ শিক্ষাগত চর্চার যৌক্তিকতা ও ন্যায়গত দিকের উন্নয়ন, নিজের কাজ ও তদসংলগ্ন পরিবেশকে আরো অর্থপূর্ণভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করে।

Kemmis (১৯৮৩) বলেছেন, A key aspect of my work since the late 1970s has been in developing the theory and practice of educational action research. Together with colleagues at Deakin and elsewhere, I have advocated "emancipatory action research and evaluation which embodies the aspirations of a critical science of education. Participatory action research (PAR) is a way of working which helps teachers, students and communities to work individually and collectively in developing their practices, their understandings of their practices, and the situations in which they live and work – to transform the work, the worker and the workplace.

ইলিয়ট (১৯৯১) বলেছেন, কর্মসহায়ক গবেষণা পেশাদারদের নির্দিষ্ট জটিলতর মানব পরিবেশে নিজ কার্যাদি বিশ্লেষণ ও বিচারপূর্বক উন্নয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। তাঁর মতে, কর্মসহায়ক

গবেষণা জ্ঞান অনুসন্ধান, পেশাগত চর্চার উন্নয়ন এবং পেশাদার ব্যক্তির দক্ষতা বিকাশ- এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক জোরালো করে এবং এদের একক ইউনিট হিসেবে সংঘটিত করে। (হোসনে আরা বেগম, ২০০৭) ।

Alrichter, Posch, Somekh (১৯৯৩) এদের মতে, কর্মসহায়ক গবেষণা এমন পদ্ধতি যা শিক্ষককে আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন বিষয়ক সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। শিক্ষকগণ কর্মসহায়ক গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন কার্যের মানোন্নয়নের সম্ভাব্য উপায় নির্ধারণে ব্রতী হন এবং বিদ্যালয় পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট হন। কর্মসহায়ক গবেষণা একটি নমনীয় পদ্ধতি যা দ্বারা গবেষণা (উপলব্ধি, জ্ঞান) পরিচালিত হয়; একই সাথে কর্মও সম্পাদিত (পরিবর্তন, উন্নয়ন) হয়।

সংজ্ঞাগুলো সতর্কভাবে বিশে- ষণ করলে কর্মসহায়ক বা কার্যোপযোগী গবেষণার ধারণা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ থেকে সহজে বলা যায়, কর্মসহায়ক গবেষণা হলো এমন একটি অনুসন্ধান পদ্ধতি যেখানে এর অংশগ্রহণকারীরাই নিজেদের সামাজিক পরিবেশে যেমন, শ্রেণিকক্ষ, অফিস, আবাসিক এলাকা ইত্যাদি অর্থাৎ তাদের কার্যক্ষেত্র থেকে সমস্যা চিহ্নিত করে; তাদের নিজস্ব কার্যপ্রণালী উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হয়; সমাধান বা উন্নয়নের জন্য নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অংশগ্রহণ করে; আত্মপ্রতিফলনের মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত ভূমিকা বুঝতে চেষ্টা করে, এর যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং সর্বোপরি পেশাগত উন্নয়ন ঘটায়। এক কথায় জ্ঞান অর্জন, অর্জিত জ্ঞানের আলোকে উন্নততর কার্যপ্রণালী প্রণয়ন ও বাস্ড়বায়ন তথা সমস্যা সমাধান বা ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো কর্মসহায়ক গবেষণার প্রধান লক্ষ্য। কাজেই বলা যায় যে, কর্মসহায়ক গবেষণা গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতায়ন, অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা, জ্ঞান আহরণ এবং সামাজিক পরিবর্তন - এই চারটি মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় (হোসনে আরা বেগম, ২০০৭)।

বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কর্মসহায়ক গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে পারেন। যেমন নৃ-বিজ্ঞানী, সমাজ বিজ্ঞানী, পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী এবং অন্যান্য অকেতাবী ব্যক্তিবর্গ এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেন (Greenwood and Lewin, ১৯৯৮; Kemmis, ১৯৯৪)।

উলে- খযোগ্য বৈশিষ্ট্য

কার্যসহায়ক গবেষণার বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায় যা এই গবেষণা প্রত্যয়কে আরও সুসংহত করবে ও সুস্পষ্টভাবে বুঝতে সহায়তা করবে।

১. গতানুগতিক গবেষণা ধারার মত শুধু 'কী ঘটছে' খোঁজ করাই কর্মসহায়ক/কার্যোপযোগী গবেষণার কাজ নয়। কমপক্ষে তিনটি প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান করা এই গবেষণার লক্ষ্য। যেমন 'কী ঘটেছে', 'কেন ঘটছে' এবং 'কীভাবে সমাধান' করা যায় -এই প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়ার লক্ষ্যে এই গবেষণা পরিচালিত হয়।

২. কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভর ও প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক (situational)। সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে সমস্যা চিহ্নিত করা এবং উক্ত প্রেক্ষাপটেই সমস্যার সমাধান করার সাথে এটি জড়িত। অন্যভাবে বললে, স্থানীয় পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যা অনুসন্ধান করা ও তার সমাধান করা এর কাজ। র‍্যাপোপোর্ট (১৯৭০, উদ্ধৃত: হপকিনস, ১৯৮৫) যেমন বলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা-পরিস্থিতির বাস্ড়ব দিকে অবদান রাখা কার্যোপযোগী গবেষণার লক্ষ্য।

৩. এই গবেষণা অংশগ্রহণকেন্দ্রিক (participatory)। গবেষণা বাস্ড়বায়ন বা প্রয়োগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সকলেই অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে এককভাবে অথবা গবেষকের সহায়তায় গবেষণা করে থাকেন। বহিরাগত গবেষকের ভূমিকা সহায়কের (facilitator) অর্থাৎ শিক্ষক সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে আর গবেষক দিক নির্দেশনা দিবে।

৪. কর্মসহায়ক গবেষণা সহযোগিতামূলক (collaborative)। এখানে গবেষক ও পেশাদার একত্রে একই প্রজেক্টে কাজ করেন। অর্থাৎ গবেষণা পরিবেশের একটর (যেমন শিক্ষক) ও বহিরাগত বিশেষজ্ঞ গবেষক -এ দুয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক কার্য প্রক্রিয়া গড়ে ওঠে। বিশেষজ্ঞের ভূমিকা এখানে সহযোগী হয়ে গবেষণা করা; তার মত বা পরিকল্পনা আরোপ করা নয়।

৫. স্ব-মূল্যায়ন (self-evaluation) এই গবেষণার একটি অন্স্ড়র্নিহিত প্রক্রিয়া। বিরাজমান পরিস্থিতিতে পরিবর্তন ও পরিমার্জন অব্যাহতভাবে মূল্যায়ন করা হয়। কোন না কোনভাবে বিদ্যমান পরিস্থিতির উন্নয়ন সাধনই এর লক্ষ্য।

৬. পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণা বহু পদ্ধতিভিত্তিক (eclectic)। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা হয় যাতে যথার্থ তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তা সমস্যার সঠিক সমাধান করা যায়।

৭. এই গবেষণা সংলাপকেন্দ্রিক (dialogic); আরোপিত কিংবা নির্দেশিত (didactic) নয়। এই বিচারে এটি 'গণতান্ত্রিক'। অর্থাৎ, গবেষক গবেষণার বিষয়ে একত্রে সংলাপ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যাকে বুঝতে সচেষ্ট হয় এবং সমাধানে উদ্যোগী হয়।

৮. এ ধরনের গবেষণা বৃত্তীয় (cyclical), একমুখী (linear) নয়। গবেষণা একাধিক চক্রে (cycle) পরিচালিত হতে পারে এবং প্রতিটি চক্রে গবেষণার ফোকাস ভিন্ন হতে পারে। সেদিক থেকে এই গবেষণা সর্পিল প্রকৃতির (spiral)।

৯. এর নকশা নমনীয় (flexible), অনত (rigid) নয়; যে কোন প্রতিক্রিয়ায় সাড়া প্রদান করাই এই গবেষণার কাজ। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে গবেষণা চলমান অবস্থায় পরিবর্তন সম্ভব।

১০. একেবারে ছোট আকারের সমস্যা অনুসন্ধান থেকে বড় আকারের সমস্যা সমাধানের জন্য এই গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব।

সহজ কথায় কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক কোন বহিরাগত পর্যবেক্ষক নন, বরং তিনি ঐ কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কর্ম পদ্ধতির উন্নতি করার চেষ্টা করেন। তিনি কাজের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেন যা বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণ করলে ইন্দ্রিয়গত উপলব্ধি, ব্যক্তি দর্শন, চেতনা প্রভৃতি দ্বারা প্রকৃত সত্য নানাভাবে প্রভাবিত হতে পারে। যেহেতু কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক নিজে কার্য পদ্ধতির একটি অংশ এবং প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন তাই গবেষণা কাজে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও তাদের মধ্যে 'আত্মসমালোচনামূলক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক' (critical friendship) গড়ে ওঠে।

এটি একমাত্র গবেষণা ধারা যার ফোকাস শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের যারা প্রকৃত ব্যক্তিত্ব (যেমন: শিক্ষক, শিক্ষার্থী), গতানুগতিক ধারায় যারা উপেক্ষিত, তাদেরই জন্য এই গবেষণা। কাজেই

'মাইক্রো' পর্যায়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী সরাসরি এই গবেষণার উপকারিতা ভাগাভাগি করতে পারেন; অপরদিকে, 'ম্যাক্রো' পর্যায়ে যারা নীতি নির্ধারণ করেন, তারা এই গবেষণার ফলকে নীতি পরিবর্তনের কাজে লাগাতে পারেন যা সত্যিকার অর্থে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে।

কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার নামের দুটি অংশ রয়েছে, কর্মসহায়ক ও গবেষণা – যার বিশ্লেষণ এর উদ্দেশ্যকে আরো স্পষ্ট করবে। এর 'গবেষণা' পদটি দ্বারা সত্য অনুসন্ধান বা জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়; অর্থাৎ, তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে কোন প্রপঞ্চ বা ঘটনাকে ভালভাবে জানতে ও বুঝতে সহায়তা করা গবেষণার মূল কাজ। অপর অংশটি হলো কর্মসহায়ক। অর্থাৎ, এ গবেষণা কর্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য উদঘাটন করেই শেষ হয় না; বরং কর্মকে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এই গবেষণার বিশেষ লক্ষ্য। অর্থাৎ, বাস্তব/ব্যবহারিকভাবে উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধানকরণ, অথবা পেশাগত চর্চা বা বিদ্যমান কর্ম পরিস্থিতির উন্নয়ন (যেমন, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন) ইত্যাদি।

কাজেই, বলা যায় এই গবেষণার প্রধান দু'ধরনের উদ্দেশ্য রয়েছে: প্রথমত, ঘটনা বা পরিস্থিতিকে বিস্তারিত ও গভীরভাবে জানা ও বুঝা, এবং দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নয়ন বা সমস্যার সমাধান করা এবং এভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। প্রচলিত গবেষণার ন্যায় কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য শুধু নতুন জ্ঞানার্জন নয়, বরং উন্নয়নের পথনির্দেশক হিসেবে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা। অর্থাৎ, কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্য হলো তত্ত্ব (theory) ও চর্চার (practice) সমন্বয়সাধন। একটি অপরটির পরিপূরক।

একজন শ্রেণিশিক্ষক বা পেশাদার ব্যক্তি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণার সাহায্য নিতে পারেন। যেমন: শিক্ষণ পদ্ধতির মানোন্নয়ন, শ্রেণিকার্যে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, শ্রেণিব্যবস্থাপনায় উদ্ভূত পরিস্থিতির সমাধান করা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কোন্নয়ন, বিদ্যালয়ভিত্তিক কর্মপ্রক্রিয়ার সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান ইত্যাদি।

কর্মসহায়ক গবেষণার গুরুত্ব

কর্মসহায়ক গবেষণা পেশাদার ব্যক্তি এবং শ্রেণি শিক্ষকের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে হলে এই গবেষণার প্রকৃতি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। এই গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. এই গবেষণায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় (হোসনে আরা বেগম ও অন্যান্য, ২০০২)। যেমন, (ক) সমস্যাটি কী? - পরিস্থিতি বা সমস্যা ভালভাবে বুঝতে চেষ্টা করা হয়; (খ) সমস্যাটির কারণ কী? - কীসের প্রভাবে এবং কেন সমস্যা উদ্ভূত হলো, এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়; (গ) সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায়? - সমস্যা ও এর কারণ চিহ্নিত করার পর কাজ শেষ হয়ে যায় না; বরং তা সমাধান করা হয়। ফলে শ্রেণি শিক্ষকের জন্য এই জাতীয় গবেষণা খুবই উপকারী।

২. সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম বা পেশাগত চর্চার বিদ্যমান অবস্থায় পরিবর্তন এনে এর উন্নয়ন ঘটানো কর্মসহায়ক গবেষণার কাজ। তাই শ্রেণি শিক্ষক, বিদ্যালয় প্রশাসনসহ যে কোন পেশাদার বা প্রাকটিশনার - এর উন্নত অনুশীলনের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. কর্মসহায়ক গবেষণায় নিয়োজিত শিক্ষক, প্রশাসক এর মনে আত্মসমালোচনার মনোভাব গড়ে ওঠে বিধায় তারা নিজ পেশার উন্নয়ন ঘটাতে সচেষ্ট থাকেন। সে ক্ষেত্রে উন্নয়নের পথে বাধাসমূহ অতিক্রম করার চেষ্টা করেন।

৪. কর্মসহায়ক গবেষণায় জড়িত শিক্ষক, তার নিজের পেশাগত ভূমিকা, শিক্ষার্থীর শিখন মান এবং শ্রেণিকক্ষ কার্যাবলির মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন।

৫. কর্মসহায়ক গবেষণা শ্রেণি শিক্ষককে গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে উৎসাহিত করে; এর ফলে শিক্ষক তার শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলির মান যাচাই করতে উদ্যোগী হন; নিজের কর্ম পরিস্থিতিকে ভালভাবে যাচাই করার সুযোগ লাভ করেন। নিজকে যাচাইমূলক প্রশ্ন করেন- যেমন, আমার ব্যবহৃত শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত হচ্ছে কি? আমি কীভাবে আমার শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি? আমি কীভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারি, ইত্যাদি (হোসনে আরা বেগম, ২০০৭)।

৬. এই ধরনের গবেষণা শিক্ষক তার কর্মস্থলে সম্পন্ন করতে পারেন। ফলে শিক্ষক তার নিজস্ব সময় ও পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কাজ পরিচালনা করতে পারেন।

৭. স্থানীয়ভাবে স্থানীয় ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে অন্যান্য গবেষণার ন্যায় এই গবেষণার জন্য খুব বাড়তি খরচের প্রয়োজন হয় না।

৮. ধারাবাহিক এবং সর্পিলাকারে সম্পাদিত হয় বলে এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসক তাদের নিজ কর্মের উন্নয়নমূলক পরিবর্তন অনুভব করতে পারে। গবেষণা ফলের ওপর তাদের স্ব-অধিকার জন্মে এবং অংশগ্রহণকারীদের আত্মপ্রত্যয়ী এবং প্রতিশ্রুতিশীল করে তোলে।

৯. কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষার্থীদেরকেও কার্যকর এবং মানসম্মত শিখনে সহযোগিতা করে।

১০. গবেষক নিজেই নিজের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করেন। বহিরাগত কোন গবেষক দ্বারা পরিকল্পিত এবং আরোপিত কর্ম সম্পাদন করা হয় না। বহিরাগত গবেষক সহায়কের ভূমিকা পালন করেন, কোন কিছু চাপিয়ে দেন না। ফলে গবেষকের পক্ষে ঘটনা বুঝা এবং এর উন্নয়ন বা সমাধান করা সহজ হয়।

১১. কর্মসহায়ক গবেষণা ধারাবাহিক বলে ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না সমস্যার সমাধান অর্জিত হয়।

১২. গণতান্ত্রিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে স্থানীয় (যেমন: শ্রেণি শিক্ষক, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক ইত্যাদি) সকলের অংশগ্রহণে ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বলে পারস্পরিক বোঝাপড়া বা সহমর্মিতার ভিত রচিত হয় এবং আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পায়।

১৩. বিভিন্ন দেশের গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংঘটিত মিথস্ক্রিয়ার মানোন্নয়নে কর্মসহায়ক গবেষণা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থী-শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ার মান প্রধানত শিক্ষার্থীর শিখনের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কাজেই, বলা যায় যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রেণি শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণায় দক্ষতা অর্জন এবং এর চর্চা করা খুব জরুরি। আমাদের শ্রেণি শিক্ষণের মান কার্যকর শিখনের জন্য

উপযুক্ত নয়। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে উচ্চ স্তরের শিখন দক্ষতার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় যেহেতু শ্রেণি শিক্ষকের ভূমিকাই মূখ্য, তাই শ্রেণি শিক্ষকের জন্য কর্মসহায়ক গবেষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যায়ন

১. কর্মসহায়ক গবেষণার ধারণা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২. কর্মসহায়ক গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো লিখুন।

৩. কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

কর্মসহায়ক গবেষণার বিভিন্ন মডেল

ভূমিকা

কর্মসহায়ক গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবদান রাখতে সক্ষম হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেশ কিছু শিক্ষাবিদ ও গবেষক কর্মসহায়ক গবেষণার বিভিন্ন মডেল প্রতিষ্ঠা করেছেন। কর্মসহায়ক গবেষণায় যাদের কাজ উল্লেখ করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছেন: কার্ট লিউইন, স্টিভেন হপকিন্স, এস. কেমিস, এল. স্টেনহাউস, জে. ইলিয়ট, এম. বেসি প্রমুখ। এছাড়াও রয়েছে এলরিখটার, পোশ এবং শোমেখ- এর কাজ এবং কান ও কিগলি-এর মডেল। এদের মধ্যে কার্ট লিউইনকে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রবক্তা বলা হয়। বিএড শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী আলোচ্য অধিবেশনে সংক্ষেপে এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ (১৯৯৩) এবং কান ও কিগলি (১৯৯৭)-এর মডেল দু'টি আলোচনা করা হবে। এছাড়া বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক কোন মডেলটি আমাদের জন্য অধিক উপযোগী হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ এর কর্মসহায়ক গবেষণার মডেলটি উপস্থাপন করতে পারবেন;
- কান ও কিগলি (১৯৯৭)- এর মডেলটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক কোন মডেলটি আমাদের জন্য অধিক উপযোগী হবে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব- ক : কর্মসহায়ক গবেষণার মডেল

- প্রশিক্ষণার্থী বন্ধুরা, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসুন। এরপর 'গবেষণা মডেল বলতে কি বোঝায়' সে বিষয়ে চোখ বন্ধ করে ২ মিনিট ভাবুন। এবার নিচের ফাঁকা জায়গায় আপনার ধারণা লিখুন। তবে তার পূর্বে ডান পাশের বক্সটি কাগজ দিয়ে ঢেকে নিন। লেখা শেষে কাগজটি সরিয়ে বক্সের লেখাটি পড়ে দেখুন আপনার ধারণা ঠিক আছে কি না।

সম্ভাব্য উত্তরঃ কোন গবেষণার মডেল সেই গবেষণার ধারা সম্পর্কে ধারণা বা সংজ্ঞা প্রদান করে। অর্থাৎ, গবেষণায় কী কী ধাপ আছে, ধাপগুলোর মধ্যে কোন ধরনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, কীভাবে ধাপগুলোর কাজ সম্পাদিত হবে ইত্যাদি সম্পর্কে সাধারণ ধারণা ও পদ্ধতি জানা যায়।

- নিচে সংক্ষেপে এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ (১৯৯৩) এবং কান ও কিগলি (১৯৯৭)- এর মডেল দু'টি আলোচনা করা হল। মডেল দুটি পাঠ করুন ও তুলনামূলক পর্যালোচনা অংশটি ভাল করে খেয়াল করুন। উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ও পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করুন।

এলরিখটার ও অন্যান্যরা কর্মসহায়ক গবেষণাকে তিনটি প্রধান ধাপে বর্ণনা করেছেন। যথা: আরম্ভকরণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ, কার্যকৌশল তৈরি এবং বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব গঠন। প্রতিটি প্রধান ধাপ আবার একাধিক কার্যনির্দেশক ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে কান এবং কিগলির মডেলটি ৩টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। পরিকল্পনা পর্যায়, পরিকল্পনা কার্যকরকরণ পর্যায় এবং প্রতিফলন পর্যায়। পর্যায়সমূহের প্রতিটিতে কয়েকটি ধাপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে।

দুটি মডেল দু'দল ভিন্ন শিক্ষাবিদ কর্তৃক প্রদত্ত হলেও তাদের মূল লক্ষ্য ও দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। অর্থাৎ, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপায় পরিকল্পনা করা ও তা বাস্ড়বায়ন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মিল রয়েছে। নিচের সারণীতে দু'টি মডেলের ধাপগুলো পাশাপাশি দেখানো হলো।

কান এবং কিগলি -এর মডেল (১৯৯৭)	**এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ এর মডেল (১৯৯৩)**
পরিকল্পনা পর্যায় ধাপ ১: সমস্যা বুঝতে সচেষ্ট হওয়া ধাপ ২: সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান ধাপ ৩ : সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিকল্পনা করা বা চিহ্নিত করা	**আরম্ভকরণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ** ধাপ ১: গবেষণা জার্নাল লিখন ধাপ ২: গবেষণার শুরু করার ইস্যু বা বিষয় নিরূপণ করা ধাপ ৩: ইস্যু বা বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন ধাপ ৪: উপাত্ত সংগ্রহকরণ ধাপ ৫: উপাত্ত বিশ্লেষণ
পরিকল্পনা কার্যকরকরণ পর্যায় ধাপ ৪: পরিকল্পিত পদক্ষেপ বাস্তবে প্রয়োগ এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ	**কার্যকৌশল তৈরি** ধাপ ৬: সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকৌশল পরিকল্পনা করা; উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবে প্রয়োগ করা।
প্রতিফলন স্তর ধাপ ৫: বাস্তবায়ন পর্যায়ে লব্ধ ফলাফল মূল্যায়ন ধাপ ৬: গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিফলন	**বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব গঠন** ধাপ ৭: বিশ্লেষণলব্ধ ফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠা; অপরের সাথে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বিনিময় করা।

কাজ-১-২.১

মূল শিখনীয় বিষয়ের সহযোগিতা নিয়ে এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ এবং কান এবং কিগলি-এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল দুটির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করে নিচের ছকে উল্লেখ করুন।

পর্যায় ও ধাপসমূহের নাম		সাদৃশ্য	বৈসাদৃশ্য

পর্ব-খঃ বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণা

বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণার অতীত খুব সমৃদ্ধ নয়। এই মিলিনিয়ামের প্রথমভাগেও এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব খুব অনুভূত হয়নি। দু'-একটি বেসরকারি সংস্থা (যেমন: অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ) সম্প্রতি তাদের শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নে কার্যসহায়ক গবেষণা ধারা অনুসরণ করা শুরু করে। এইচএসটিটিআই-এর মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই গবেষণার একটি পরিচিতিমূলক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শুরু থেকে নায়েম তাদের ৩০ দিনব্যাপী শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্সের ১/২টি অধিবেশন কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য বরাদ্দ করে আসছে। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ শিক্ষা গবেষণা কোর্সের দুই/একটি ইউনিট

হিসেবে এ গবেষণা ধারা আলোচনা করেন। আইইআর-এর গবেষণা কোর্সের শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টির সাথে অনেকটা হাতে-কলমে (যদিও পূর্ণাঙ্গ নয়) পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছে গত শতকের একেবারে শেষভাগ থেকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীগণ এই কোর্সটির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছেন বাস্ড়বে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষা গবেষণায় 'কর্মসহায়ক গবেষণা' ক্রমাগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ধারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালে TQI-SEP এর তত্ত্বাবধানে প্রবর্তিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একে একটি কোর্স হিসেবে স্থান দিয়ে এর প্রয়োজনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। তবে এই বিষয়টির কার্যকর চর্চা এখনও সময়সাপেক্ষ বিষয়।

এবারে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত পুরাতন বিএড প্রোগ্রামের EDB 3304 কোর্স বই হতে ''বাংলাদেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায়'' গবেষণার অবস্থান সম্পর্কিত অংশটি তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক হলেও কোন প্রকারের শিক্ষা গবেষণা খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। এর বিবিধ কারণ রয়েছে —

- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ড় শিক্ষাক্রম নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞ হতে শুরু করে বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক সব শ্রেণির বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। তবে চূড়ান্ড় শিক্ষাক্রম একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে স্থানীয়ভাবে বিষয় শিক্ষক এর মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেন না।
- যেহেতু স্থানীয়ভাবে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের কোন সুযোগ শিক্ষকদের নেই তাই শিক্ষকরা কোন প্রকারের স্থানীয় গবেষণার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন না।
- স্থানীয় পর্যায়ে কোন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় না।
- গবেষণা কাজের যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করার জন্য কোন দাতা প্রতিষ্ঠান খুব আগ্রহ প্রকাশ করেনা।
- কোন স্বীকৃত শিক্ষা গবেষক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অংশগ্রহণ কামনা করে গবেষণা কাজ পরিচালনার স্বপক্ষে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন না।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে action research বা কার্যোপযোগী গবেষণা করার উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন না (হোসেন, ১৯৯৬)।

বাংলাদেশে শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক কর্মসহায়ক গবেষণা

কার্ট লিউইন এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল —

বাংলাদেশের বিদ্যালয় শিক্ষকগণ তাদের শ্রেণিকক্ষ-ভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণায় কোন মডেল ব্যবহার করবেন? গবেষণার কাজকে সরলভাবে বুঝার জন্য কার্ট লিউইনের মডেলটি বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, এটি একটি সহজ বোধগম্য মডেল। কার্ট লিউইন এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেলকে চারটি ধাপের একাধিক চক্র হিসেবে দেখানো যায়। এই মডেলটি প্রকৃতপক্ষে একটি চার ধাপবিশিষ্ট গবেষণা কার্যের রূপরেখা। ধাপগুলো হলো (ক) গবেষণা করার পরিকল্পনা করা; (খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; (গ) বাস্তবায়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ; এবং (ঘ) মূল্যায়নভিত্তিক প্রতিফলন। রৈখিক চিত্রের মাধ্যমে এই মডেলটি উপস্থাপন করা হলো।

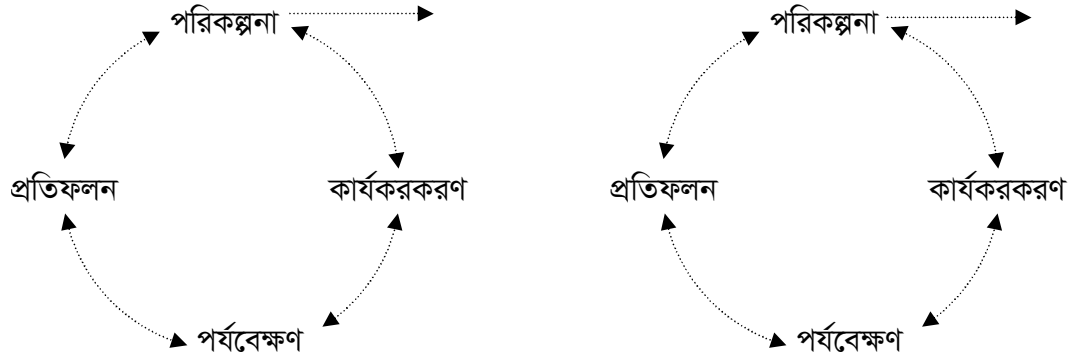

- কার্ট লিউইন-এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল বাংলাদেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী কী সুবিধা এবং কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে বলে আপনি মনে করেন উল্লেখ করুন।

সুবিধাঃ

১।

২।

৩।

অসুবিধাঃ

১।

২।

৩।

৪।

৫।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়

কর্মসহায়ক গবেষণার বিভিন্ন মডেল

কর্মসহায়ক গবেষণার যারা প্রবক্তা তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যেভাবে অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করলে তা নির্ধারিত সমস্যার জন্য যথাযথ ও উপযুক্ত হবে সেভাবে গবেষণার নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন। এছাড়াও তারা অনুসন্ধান চালিয়ে দেখেছেন যে, কীভাবে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করলে তা কার্যক্ষেত্রে সহায়ক হবে। এভাবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিভিন্ন শিক্ষাবিদ ও গবেষকের কর্মপদ্ধতি এক একটি মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তবে কোন কোন শিক্ষাবিদ (স্টুয়ার্ট, ১৯৯০) কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে 'মডেল' শব্দটির ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করেছেন। হোসনে আরা বেগম, অন্যান্য (২০০২) এর ভাষায়, "কর্মসহায়ক গবেষণার কোন অনড় কিংবা সরলরৈখিক তাত্ত্বিক ভিত্তি বা 'মডেল' নেই যেমন রয়েছে গতানুগতিক গবেষণা ধারায়"। এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো যে 'মডেল' শব্দটির ব্যবহার গবেষণা প্রক্রিয়াকে একটি স্থির প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে যা সাধারণভাবে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু দর্শনগত দিক থেকে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিস্থিতি নির্ভর ও নমনীয়। কাজেই, স্টুয়ার্টের মতে, কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে 'মডেল'- এর প্রয়োগ যথাযথ নয়। কারণ তা এর নমনীয়তা বৈশিষ্ট্যের অর্থকে অস্পষ্ট বা আড়াল করতে পারে।

কর্মসহায়ক গবেষণায় যাদের কাজ উল্লেখ করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছেন: কার্ট লিউইন, স্টিভেন হপকিন্স, এস. কেমিস, এল. স্টেনহাউস, জে. ইলিয়ট, এম. বেসি প্রমুখ। এছাড়া এলরিখটার, পোশ এবং শোমেখ - এর কাজ এবং কান এবং কিগলি -এর মডেল। এদের মধ্যে কার্ট লিউইনকে কর্মসহায়ক গবেষণার প্রবক্তা বলা হয়।

বিএড শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী এখানে সংক্ষেপে এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ (১৯৯৩) এবং কান ও কিগলি (১৯৯৭) -এর দুটি মডেল উপস্থাপন করা হলো।

এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ (১৯৯৩) এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল

এলরিখটার ও অন্যান্যরা কর্মসহায়ক গবেষণাকে তিনটি প্রধান ধাপে বর্ণনা করেছেন। প্রতিটি প্রধান ধাপ আবার একাধিক কার্যনির্দেশক ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধান ধাপ তিনটি হলো :

১. **আরম্ভ করার পর্যায় :** এ পর্যায়ে গবেষক বা শিক্ষক কী নিয়ে গবেষণা কার্য শুরু করবেন সে সম্পর্কে একটি দিক নির্দেশনা লাভের চেষ্টা করবেন। অনুসন্ধানীয় পরিস্থিতি বা পরিবেশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভে সচেষ্ট হবেন। এই পর্যায়ে গবেষক/শিক্ষক যে সকল সুনির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে সচেষ্ট হবেন তা ৫টি ধাপে বর্ণনা করা হয়েছে।

- ১ম ধাপ: গবেষণা জার্নাল লিখন– গবেষণা জার্নালে কার্যপ্রণালীসহ গবেষণা সম্পর্কিত কোন বিষয়ের ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কাজ ও ঘটনার বর্ণনা, পর্যবেক্ষণ পরবর্তী তথ্য এবং বিভিন্ন কাজের প্রতিফলন গবেষক লিপিবদ্ধ করতে পারেন। গবেষণা জার্নাল সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য ইউনিট ৩ এর অধিবেশন ২-এর মূল শিখনীয় বিষয় দেখুন।

- ২য় ধাপ: গবেষণা শুরু করার একটি ইস্যু/বিষয় নিরূপণ- গবেষক বা শিক্ষক একটি বিষয় চিহ্নিত করবেন যা তিনি গবেষণা করতে চান। যেমন: শ্রেণিকক্ষের শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া।
- ৩য় ধাপ: এক্ষেত্রে গবেষক তার চিহ্নিত বিষয়কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করেন। অর্থাৎ, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার ঠিক কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা হবে। যেমন: শ্রেণিতে বর্তমানে বক্তৃতা-নির্ভর শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাতে মনে হচ্ছে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। তাই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে সক্রিয় রাখার জন্য একতরফা বক্তৃতার মাত্রা কমিয়ে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়া।
- ৪র্থ ধাপ: তথ্য সংগ্রহ- অতঃপর নির্বাচিত সমস্যা (যেমন: শিক্ষার্থীরা কেন সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে না) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অর্থাৎ, শিক্ষক/গবেষক শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা বা সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে অনীহা কেন; তারা কোথায় সমস্যা বোধ করছে; কী পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় হবে; কী উপায়ে তাদের শ্রেণি কার্যাবলিতে সংশ্লিষ্ট করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করবেন।
- ৫ম ধাপ: এই ধাপে গবেষক সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করবেন। অর্থাৎ, সংগৃহীত তথ্য থেকে শিক্ষার্থীদের মনোভাব বুঝতে চেষ্টা করবেন; সম্ভাব্য উপায় কী হতে পারে সে সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য থেকে অনুমান করতে সচেষ্ট হবেন; বাস্ড়বসম্মত অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কী হতে পারে ইত্যাদি। যেমন, শুধু বক্তৃতা না দিয়ে তার সাথে প্রশ্নোত্তর, দলবদ্ধ বা জোড়বদ্ধ আলোচনা ইত্যাদি একাধিক পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২. কর্ম কৌশল চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন: এ পর্যায়ে গবেষকের কাজ হলো সমস্যা উত্তরণের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা

- ৬ষ্ঠ ধাপ: এই ধাপে গবেষক তার সমস্যা সমাধানের জন্য কর্ম কৌশল নির্ধারণ করেন; এই কৌশল কীভাবে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন তা পরিকল্পনা করেন; পরিকল্পিত কৌশল অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করেন, পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

৩. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও তত্ত্ব গঠন: বাস্তবায়ন পর্যায় থেকে লব্ধ তথ্য বিশ্লেষণ করা

- ৭ম ধাপ: জ্ঞান প্রতিষ্ঠা এবং তা অন্যের সাথে বিনিময় করা। এই পর্যায়ে বিশ্লেষণকৃত তথ্য থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অর্থাৎ, সমস্যার সমাধান-এর দিক নির্দেশনা পূর্ণাঙ্গ হয়। যেমন: শুধু বক্তৃতা পদ্ধতি প্রয়োগ করলে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ হারায় খুব তাড়াতাড়ি। তাই এর সাথে প্রশ্নোত্তর বা দলীয় কাজ চালু করলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়বে। ফলে তাদের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

কান এবং কিগলি- এর কর্মসহায়ক মডেল (১৯৯৭)

এই মডেলটি ৩টি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়। পর্যায়সমূহের প্রতিটিতে কয়েকটি ধাপে ভিন্ন ভিন্ন কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। পর্যায়গুলো ধাপসহ উল্লেখ করা হলো।

পরিকল্পনা পর্যায়: এই পর্যায়টি ৩টি ধাপে সম্পন্ন হয়

ধাপ ১: গবেষণা সমস্যা ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করা।

ধাপ ২: গবেষণা প্রকল্প -এর নকশা প্রণয়ন।

ধাপ ৩: নকশা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। অর্থাৎ, পরিকল্পিত নকশা বাস্তবায়ন। অথবা সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ ও তা বাস্তবে প্রয়োগ করার পরিকল্পনা করা।

কার্যকরকরণ পর্যায়: পরিকল্পিত সমাধান বাস্তবে প্রয়োগ

ধাপ ৪: একটি পরিকল্পিত কার্য বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং এর ফলাফল পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়।

প্রতিফলন পর্যায়: শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যের প্রতিফলন করা

ধাপ ৫: পর্যবেক্ষণলব্ধ ফল মূল্যায়ন করা।

ধাপ ৬: প্রতিটি কার্য ধাপ ও গবেষণা ফল-এর ওপর গবেষকের আত্মপ্রতিফলন।

দুটি মডেল দু'দল ভিন্ন শিক্ষাবিদ কর্তৃক প্রদত্ত হলেও তাদের মূল লক্ষ্য ও দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে। অর্থাৎ, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপায় পরিকল্পনা করা ও তা বাস্ড়বায়ন করা। নিচের সারণীতে দুটি মডেলকে পাশাপাশি দেখানো হলো।

কান এবং কিগলি -এর মডেল (১৯৯৭) (Kuhne and Quigley)	**এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ এর মডেল (১৯৯৩) (Altrichter, Posch and Somekh)**
পরিকল্পনা পর্যায় ধাপ ১: সমস্যা বুঝতে সচেষ্ট হওয়া ধাপ ২: সমস্যার সংজ্ঞা প্রদান ধাপ ৩ : সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ পরিকল্পনা করা বা চিহ্নিত করা	**আরম্ভকরণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ** ধাপ ১: গবেষণা জার্নাল লিখন ধাপ ২: গবেষণার শুরু করার ইস্যু বা বিষয় নিরূপণ করা ধাপ ৩: ইস্যু বা বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন ধাপ ৪: উপাত্ত সংগ্রহকরণ ধাপ ৫: উপাত্ত বিশ্লেষণ
পরিকল্পনা কার্যকরকরণ পর্যায় ধাপ ৪: পরিকল্পিত পদক্ষেপ বাস্তবে প্রয়োগ এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ	**কার্যকৌশল তৈরি** ধাপ ৬: সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকৌশল পরিকল্পনা করা; উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবে প্রয়োগ করা।

প্রতিফলন স্তর	বিশ্লেষণ এবং তত্ত্ব গঠন
ধাপ ৫: বাস্তবায়ন পর্যায়ে লব্ধ ফলাফল মূল্যায়ন ধাপ ৬: গবেষণা প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিফলন	ধাপ ৭: বিশ্লেষণলব্ধ ফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও জ্ঞান প্রতিষ্ঠা; অপরের সাথে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান বিনিময় করা।

বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণা

বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণার অতীত খুব সমৃদ্ধ নয়। এই মিলিনিয়ামের প্রথমভাগেও এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব খুব অনুভূত হয়নি। দু-একটি বেসরকারি সংস্থা (যেমন: অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ) তাদের শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়নে কার্যসহায়ক গবেষণা ধারা অনুসরণ করা শুরু করে। এইচএসটিটিআই-এর মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই গবেষণার একটি পরিচিতিমূলক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শুরু থেকে নায়েম তাদের ৩০ দিনব্যাপী শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি কোর্সের দু-একটি অধিবেশন কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য বরাদ্দ করে আসছে বেশ অনেকদিন যাবৎ। এছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ শিক্ষা গবেষণা কোর্সের দুই/একটি ইউনিট হিসেবে এ গবেষণা ধারা আলোচনা করেন। আইইআর -এর গবেষণা কোর্সের শিক্ষার্থীরা এই বিষয়টির সাথে অনেকটা হাতে-কলমে (যদিও পূর্ণাঙ্গ নয়) পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে আসছে গত শতকের একেবারে শেষভাগ থেকে। এক্ষেত্রে শিক্ষক-প্রশিক্ষণার্থীগণ এই কোর্সটির যৌক্তিকতা যাচাইয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছেন বাস্তবে।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের শিক্ষা গবেষণায় 'কর্মসহায়ক গবেষণা' ক্রমাগতভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ধারা হিসেবে পরিচিতি লাভ করছে। বিশেষ করে ২০০৬ সালে প্রবর্তিত নতুন শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে একে একটি বিষয় হিসেবে স্থান দিয়ে এর প্রয়োজনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। তবে এই বিষয়টির কার্যকর চর্চা এখনও সময়সাপেক্ষ বিষয়।

এবারে প্রথমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব এডুকেশন পরিচালিত পুরাতন বিএড প্রোগ্রামের EDB 3304 কোর্স বই হতে ''বাংলাদেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় গবেষণার অবস্থান'' সম্পর্কিত অংশটি তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশে বিদ্যালয়ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যাপক হলেও কোন প্রকারের শিক্ষা গবেষণা খুব একটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে নাই। এর বিবিধ কারণ রয়েছে —

- মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাক্রম নির্ধারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় বিশেষজ্ঞ হতে শুরু করে বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক সব শ্রেণির বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। তবে চূড়ান্ত শিক্ষাক্রম একবার নির্ধারিত হয়ে গেলে স্থানীয়ভাবে বিষয় শিক্ষক এর মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারেন না।
- যেহেতু স্থানীয়ভাবে শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধনের কোন সুযোগ শিক্ষকদের নেই তাই শিক্ষকরা কোন প্রকারের স্থানীয় গবেষণার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন না।
- স্থানীয় পর্যায়ে কোন গবেষণার প্রয়োজনীয়তা তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় না।

- গবেষণা কাজে যে অর্থের প্রয়োজন হয় তা সরবরাহ করার জন্য কোন দাতা প্রতিষ্ঠান খুব আগ্রহ প্রকাশ করেনা।
- কোন স্বীকৃত শিক্ষা গবেষক বিদ্যালয় শিক্ষকদের অংশগ্রহণ কামনা করে গবেষণা কাজ পরিচালনার স্বপক্ষে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন না।
- বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ নিজস্ব উদ্যোগে শিক্ষণ-শিখন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানকল্পে action research বা কার্যোপযোগী গবেষণা করার উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন না।

এরপর উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, রাজশাহীতে সম্পাদিত কর্মসহায়ক গবেষণার একটি শিরোনাম তালিকা উল্লেখ করা হলো। এই প্রতিবেদনগুলো বাংলায় সম্পাদিত হয়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।

১. শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক পাঠে অনীহা ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার ৩. সনাতন পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের ধারাঃ বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের নকল প্রবণতার কারণ ৪. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির কারণ ও প্রতিকার ৫. শিক্ষকদের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে অনীহার কারণ ও প্রতিকার ৬. গণিত শিক্ষাদানে শিক্ষকদের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে অনীহা ৭. গণিত পাঠ্যসূচি পরিমার্জন (৫৬ দিনের প্রশিক্ষণ কোর্সের গণিত পাঠ্যসূচি)	৮. সকল শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্যক্রমে সমভাবে আকর্ষিত হয় নাঃ কারণ ও প্রতিকার ৯. শ্রেণিকক্ষ পাঠদানে কর্মশালার গুরুত্ব ১০. বর্তমান গ্রেডিং পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের সঠিক মূল্যায়নে বাধাস্বরূপ ১১. সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমের অভাব শিক্ষাক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নে বাধাস্বরূপ ১২. শুধুমাত্র বক্তৃতা পদ্ধতি সঠিক পাঠদানে অন্তরায় ১৩. কোচিংকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অন্তরায়ঃ প্রতিকার ১৪. পাঠ্যপুস্তক পাঠে শিক্ষার্থীদের অনীহার কারণ ও প্রতিকার

বাংলাদেশে শ্রেণি শিক্ষক কর্তৃক কর্মসহায়ক গবেষণা

বাংলাদেশের বিদ্যালয় শিক্ষকগণ তাদের শ্রেণিকক্ষ-ভিত্তিক কর্মসহায়ক গবেষণায় কোন মডেল ব্যবহার করবেন? গবেষণার কাজকে সরলভাবে বুঝার জন্য কার্ট লিউইনের মডেলটি বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ, এটি একটি সহজ বোধগম্য মডেল। কার্ট লিউইন এর কর্মসহায়ক গবেষণা মডেল কে চারটি ধাপের একাধিক চক্র হিসেবে দেখানো যায়। এই মডেলটি প্রকৃতপক্ষে একটি চার ধাপবিশিষ্ট গবেষণা কার্যের রূপরেখা। ধাপগুলো হলো (ক) গবেষণা করার পরিকল্পনা

করা; (খ) পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; (গ) বাস্তবায়ন পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ; এবং (ঘ) মূল্যায়নভিত্তিক প্রতিফলন। রৈখিক চিত্রের মাধ্যমে এই মডেলটি উপস্থাপন করা হলো।

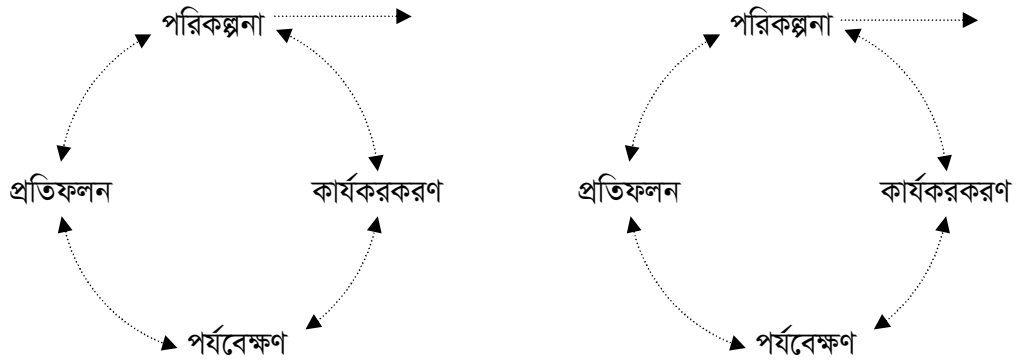

ইউনিট ৩ এর অধিবেশন ১- এ কার্ট লিউইন-এর ধাপসমূহের অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করা হয়েছে বলে এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হল না।

মূল্যায়ন

১. এলরিখটার, পোশ ও শোমেখ-এর কর্মসহায়ক গবেষণার মডেলটি বাংলাদেশে ব্যবহারোপযোগী কিনা তা আলোচনা করুন।

২. কান ও কিগলি (১৯৯৭) -এর মডেলটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. বাংলাদেশে কর্মসহায়ক গবেষণার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক কোন মডেলটি আমাদের জন্য অধিক উপযোগী হবে সে বিষয়ে আপনার মতামত দিন।

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

কর্মসহায়ক গবেষণার মনচিত্র (Mind Mapping)

ভূমিকা

কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তপ্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া, চিন্তা সংরক্ষণ করা এবং সর্বোপরি তা দর্শনযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা- এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার নামই মনচিত্র। অন্য কথায় মন চিত্র হলো চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার একটি সংগঠিত উপায় (organized way of thinking)। সাধারণত রেখাচিত্রের মাধ্যমে চিন্তাকৃত ধারণা ও এর উপাংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয় যা বোধগম্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মনচিত্র হলো এক ধরনের উপকরণ যা কর্মসহায়ক গবেষককে উত্তমভাবে চিন্তা করতে ও তা স্মরণ রাখতে সাহায্য করে এবং উদ্ভাবনমূলক উপায়ে সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনাকরণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার পথনির্দেশ করে। আলোচ্য অধিবেশনে মনচিত্রের ধারণা, তৈরির নিয়ম, প্রকারভেদ, কর্মসহায়ক গবেষণায় এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি –

- মনচিত্র (Mind Mapping) - এর ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ধরনের মনচিত্র তৈরি করতে পারবেন;
- মনচিত্র তৈরির নিয়ম বর্ননা করতে পারবেন এবং
- কর্মসহায়ক গবেষণায় মনচিত্র-এর ব্যবহার উল্লেখ করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব - ক : মনচিত্র- এর ধারণা এবং মনচিত্র তৈরির উপায়

মনচিত্র হলো চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার একটি সংগঠিত উপায়। সাধারণত রেখাচিত্রের মাধ্যমে চিন্তাকৃত ধারণা ও এর উপাংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয় যা বোধগম্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। মনচিত্র তৈরির দক্ষতা সহজে আয়ত্ত্ব করা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে কিছু রেখা অংকন করে চিন্তার ভাষাকে সহজে প্রদর্শন করা যায়। রেখা চিত্রের সাথে সম্ভব হলে রঙিন কালি, ছবি, সংকেত ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় যা ভাবনার আঙ্গিক সহজভাবে উপস্থাপন করে। মনচিত্র চিন্তা এবং লেখার সময় খুব ভাবনা করে কালক্ষেপণ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম কাজ হলো খুব দ্রুত লেখা সম্পন্ন করা। এর সঠিকতা বা উপস্থাপন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন হবে না। ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মনচিত্রের একাধিক কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রেখাচিত্রের পাশাপাশি গাছ (কান্ড, শাখা, পাতা) অথবা প্রাণী, গোত্র ইত্যাদি যা দ্বারা অভিজ্ঞতাসমূহের বিশ্লেষণ করা যাবে। মনচিত্র তৈরির সময় মনের ওপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

একটি মনচিত্র সরল কিংবা জটিল হতে পারে। সে হিসেবে মনচিত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য মনচিত্রের মধ্যে রয়েছে-

- মাকড়সা মনচিত্র ঃ এই মনচিত্রে মূল বিষয়টিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ এর চারপাশে স্থাপন করা হয়।
- চেইন/শিকল মনচিত্রঃ এ ধরনের মনচিত্র একটি কেন্দ্রীয় ধারণাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে প্রসারিত করে। নিচের চিত্রটি চেইন/শিকল মনচিত্রের উদাহরণ।

কাজ-১-৩.১

- **শিক্ষার্থী বন্ধুরা, মনচিত্রের ধরনগুলো সম্পর্কে আপনারা জানলেন। এবার বিষয় নির্দিষ্ট করে একটি চেইন/শিকল মনচিত্র তৈরি করুন।**

কাজ-১-৩.২

- **যে কোন বিষয় নির্দিষ্ট করে একটি মাকড়সা মনচিত্র তৈরি করুন।**

পর্ব - খঃ কর্মসহায়ক গবেষণায় মনচিত্রের ব্যবহার

কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মনচিত্র হলো এক ধরনের উপকরণ যা কর্মসহায়ক গবেষককে উত্তমভাবে চিন্তা করতে ও তা স্মরণ রাখতে সাহায্য করে এবং উদ্ভাবনমূলক উপায়ে সমস্যার সমাধানে পরিকল্পনাকরণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার পথনির্দেশ করে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কোন বিষয়ে মনচিত্র তৈরি করার সাথে সংযুক্ত করা যায়। মনচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হলো এটি গবেষককে তার চিন্তা প্রসারিত করতে সাহায্য করে যা মূলত গবেষকের বিশ্লেষণাত্মক ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতা ও একই সাথে নমনীয়তাকে উৎসাহিত করে, যা কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় একটি কৌশল। কর্মসহায়ক গবেষক তার গবেষণা কর্মের সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মনচিত্র ব্যবহার করতে পারেন।

কাজ-১-৩.৩

- **কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য আপনি কীভাবে মন চিত্র ব্যবহার করতে পারেন, ব্যাখ্যা করুন।**

ইউনিট ১ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

মনচিত্র-এর ধারণা

মনচিত্র কী?

কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তা প্রক্রিয়ায় জড়িত হওয়া, চিন্তা সংরক্ষণ করা এবং সর্বোপরি তা দর্শনযোগ্যভাবে উপস্থাপন করা- এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার নামই মনচিত্র। অন্য কথায় মনচিত্র হলো চিন্তন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হওয়ার একটি সংগঠিত উপায় (organized way of thinking)। সাধারণত রেখাচিত্রের মাধ্যমে চিন্তাকৃত ধারণা ও এর উপাংশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয় যা বোধগম্য হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

মনচিত্র তৈরির দক্ষতা সহজে আয়ত্ত্ব করা যায়। কারণ, এক্ষেত্রে কিছু রেখা অংকন করে চিন্তার ভাষাকে সহজে প্রদর্শন করা যায়। রেখা চিত্রের সাথে সম্ভব হলে রঙিন কালি, ছবি, সংকেত ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় যা ভাবনার আঙ্গিক সহজভাবে উপস্থাপন করে।

কর্মসহায়ক গবেষকের জন্য মনচিত্রের সুবিধা

কর্মসহায়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মনচিত্র হলো এক ধরনের উপকরণ যা কর্মসহায়ক গবেষককে প্রথমত, উত্তমভাবে চিন্তা করতে এবং স্মরণ রাখতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়ত, মনচিত্র উদ্ভাবনমূলক উপায়ে সমস্যার সমাধান পরিকল্পনাকরণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করার পথনির্দেশ দেয়। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কোন বিষয়ে মনচিত্র তৈরি করার সাথে সংযুক্ত করা যায়।

মনচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য গুণ হলো এটি গবেষককে তার চিন্তা প্রসারিত করতে সাহায্য করে যা গবেষকের বিশ্লেষণাত্মক ধারণাকে সমৃদ্ধ করে। এটি প্রকৃতপক্ষে সৃজনশীলতা ও একই সাথে নমনীয়তাকে উৎসাহিত করে, যা কর্মসহায়ক গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় একটি কৌশল।

এটি গবেষককে একমুখী সরলরৈখিক চিন্তা থেকে বিকল্প অনেক দিক নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ দেয়। এর ফলে নতুন বাস্তবসম্মত চিন্তার দিগন্ত উন্মোচিত হয়, অনুসন্ধানের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বহু বিকল্প গবেষককে তার সমস্যার উপযুক্ত সমাধান নির্বাচনের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে।

মনচিত্র যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারলে তা গবেষকের জন্য খুব ভাল একটি উপকরণ হতে পারে। মনচিত্র কার্যকর তখনই হবে যখন তা মস্তিষ্কবান্ধব হবে ।

একজন গবেষক তার গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোন পর্যায়ে মনচিত্র- এর প্রয়োগ ঘটাতে পারেন।

কীভাবে মনচিত্র তৈরি করতে হবে?

একটি সাদা কাগজ নিন। আপনার মূল ধারণাটি মাঝখানে বা কেন্দ্রে লিখুন। এর পর কেন্দ্রীয় ধারণাটিকে ঘিরে নতুন ধারণা বা কোন সংশ্লিষ্ট পদক্ষেপ চিন্তা করুন। এ সময় মূল ধারণায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন এবং এর সম্ভাব্য অন্যান্য উপাংশ বা শাখাসমূহ কী হতে পারে তা মনে মনে চিন্তা করুন এবং একটি চিত্র প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করুন। অতঃপর নিজ ভাষায় নতুন ধারণাসমূহ কেন্দ্রীয় ধারণার চারপাশে লিখুন এবং ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করুন। স্পষ্টতার জন্য ভিন্ন রঙের কালি ব্যবহার করতে পারেন। প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে মনচিত্রের একটি কাঠামো উল্লেখ করা হলো।

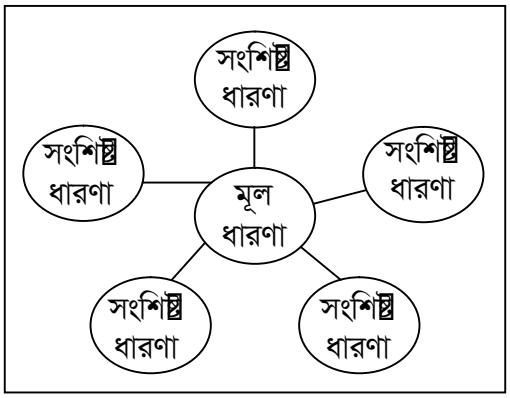

মনচিত্র তৈরির সময় যা করণীয়

- চিন্তা এবং লেখার সময় খুব ভাবনা করে কালক্ষেপণ করার প্রয়োজন নেই। প্রথম কাজ হলো খুব দ্রুত লেখা সম্পন্ন করা। এর সঠিকতা বা উপস্থাপন নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব প্রশ্রয় দেয়া সমীচীন হবে না। কারণ, কালক্ষেপণ উদ্ভাবনমূলক চিন্তাকে বিলীন বা সরল চিন্তায় রূপান্তরিত করতে পারে।
- মনচিত্র তৈরির সময় মনের পূর্ব-ধারণকৃত তথ্য বা ছবি সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা প্রয়োজন। কারণ, তা নতুন চিন্তাকে প্রভাবিত করতে পারে এবং চিন্তার বিষয়কে আড়াল বা অস্পষ্ট করতে পারে।
- প্রশিক্ষণার্থীরা বড় আকারের কাগজ বা পোস্টার কাগজ ব্যবহার করবেন যাতে অন্যরা তা প্রদর্শিত হওয়ার পর স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে।
- চিন্তন প্রক্রিয়ায় একটি দলের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে হলে মনচিত্রের একাধিক কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, রেখাচিত্রের পাশাপাশি গাছ (কান্ড, শাখা, পাতা) অথবা প্রাণী, গোত্র ইত্যাদি যা দ্বারা অভিজ্ঞতাসমূহের বিশ্লেষণ করা যাবে।
- মনচিত্র তৈরির সময় মনের ওপর কোন প্রকার চাপ প্রয়োগ করা যাবে না।

মনচিত্রের প্রকারভেদ

একটি মনচিত্র সরল থেকে জটিল হতে পারে। সে হিসেবে মনচিত্রকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য মনচিত্রের মধ্যে রয়েছে-

(ক) **মাকড়সা মনচিত্র :** এই মনচিত্রে মূল বিষয়টিকে কেন্দ্রে স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট ধারণাসমূহ এর চারপাশে স্থাপন করা হয়। পরের পৃষ্ঠায় চিত্রটি একটি মাকড়সা মনচিত্রের উদাহরণ।

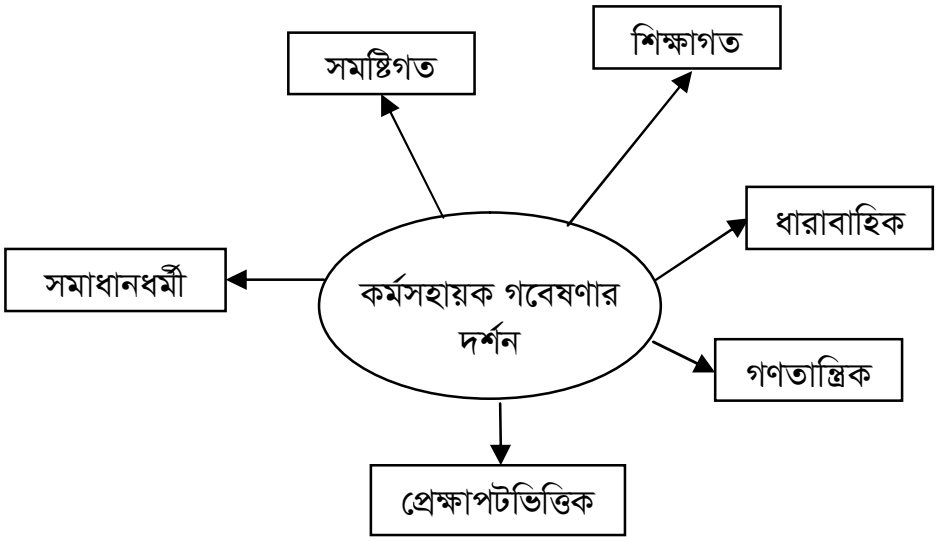

(খ) **চেইন/শিকল মনচিত্রঃ** এ ধরনের মনচিত্র একটি কেন্দ্রীয় ধারণাকে ক্রমান্বয়ে ধাপে ধাপে প্রসারিত করে। নিচের চিত্রটি চেইন/শিকল মনচিত্রের উদাহরণ।

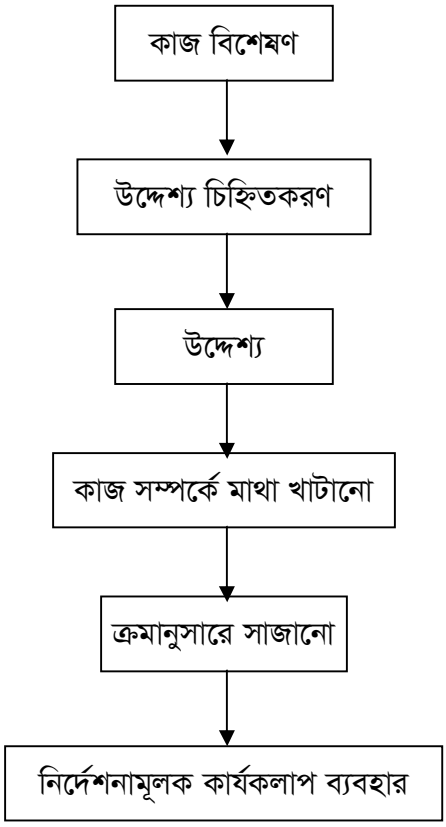

কর্মসহায়ক গবেষণায় মনচিত্রের ব্যবহার

কর্মসহায়ক গবেষক তার গবেষণা কর্মের সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মনচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। যেমন: একজন শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণিতে কর্মসহায়ক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে চান। তিনি তার সুনির্দিষ্ট সমস্যা নিরূপণের জন্য মনচিত্র ব্যবহার করতে পারেন। কাজেই, তিনি প্রথমে শ্রেণিকক্ষের সমস্যা নিয়ে ১ম মনচিত্র তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতিকে নির্বাচন করে তার পরিবর্তন করার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি উপযুক্ত পদ্ধতি নিরূপণের জন্য ২য় মনচিত্রটি তৈরি করতে পারেন।

প্রথম মনচিত্র : শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন সমস্যা

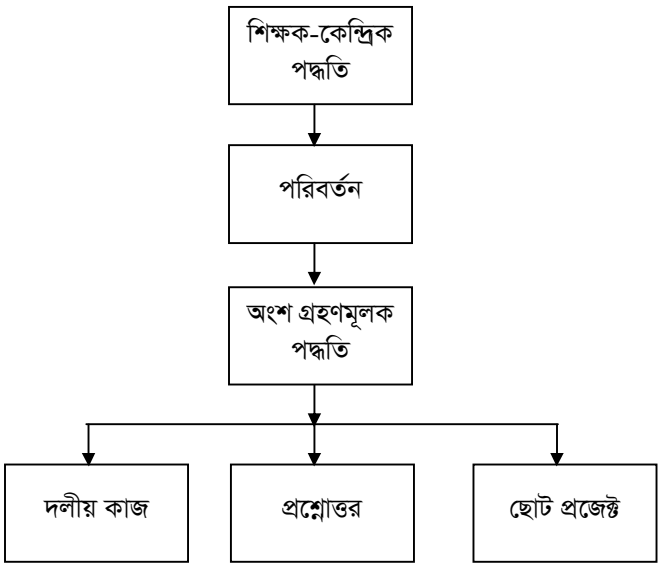

দ্বিতীয় মনচিত্র : সমস্যা সমাধান

এভাবে একজন কর্মসহায়ক গবেষক নির্বাচিত সমস্যার সমাধান, গবেষণা পদ্ধতি, বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে মনচিত্র তৈরি করে উপকৃত হতে পারেন।

মূল্যায়ন

১. মনচিত্র বলতে কী বুঝায়?

২. মাকড়সা এবং শিকল মনচিত্রের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য নির্দেশ করুন।

৩. একজন কর্মসহায়ক গবেষক কোন কোন ক্ষেত্রে মনচিত্র ব্যবহার করতে পারেন?

৪. একজন কর্মসহায়ক গবেষক 'গবেষণা পরিকল্পনা' বিষয়ে মনচিত্র তৈরি করতে চাইলে তিনি এক্ষেত্রে কোন ধরনের মনচিত্র উপযুক্ত মনে করবেন কেন?

৫. বিষয় নির্দিষ্ট করে একটি মাকড়সা মনচিত্র তৈরি করুন।

৬. বিষয় নির্দিষ্ট করে একটি চেইন/শিকল মনচিত্র তৈরি করুন।

ইউনিট ২ : কর্মসহায়ক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা

অধিবেশন ৪ : কর্মসহায়ক গবেষণার সুবিধা

অধিবেশন ৫ : কর্মসহায়ক গবেষণার নৈতিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

অধিবেশন ৬ : কর্মসহায়ক গবেষণার নৈতিক বিবেচ্য কৌশলাদি